বিনষ্ট রাজনীতি ও সংস্কৃতি

যতীন সরকার

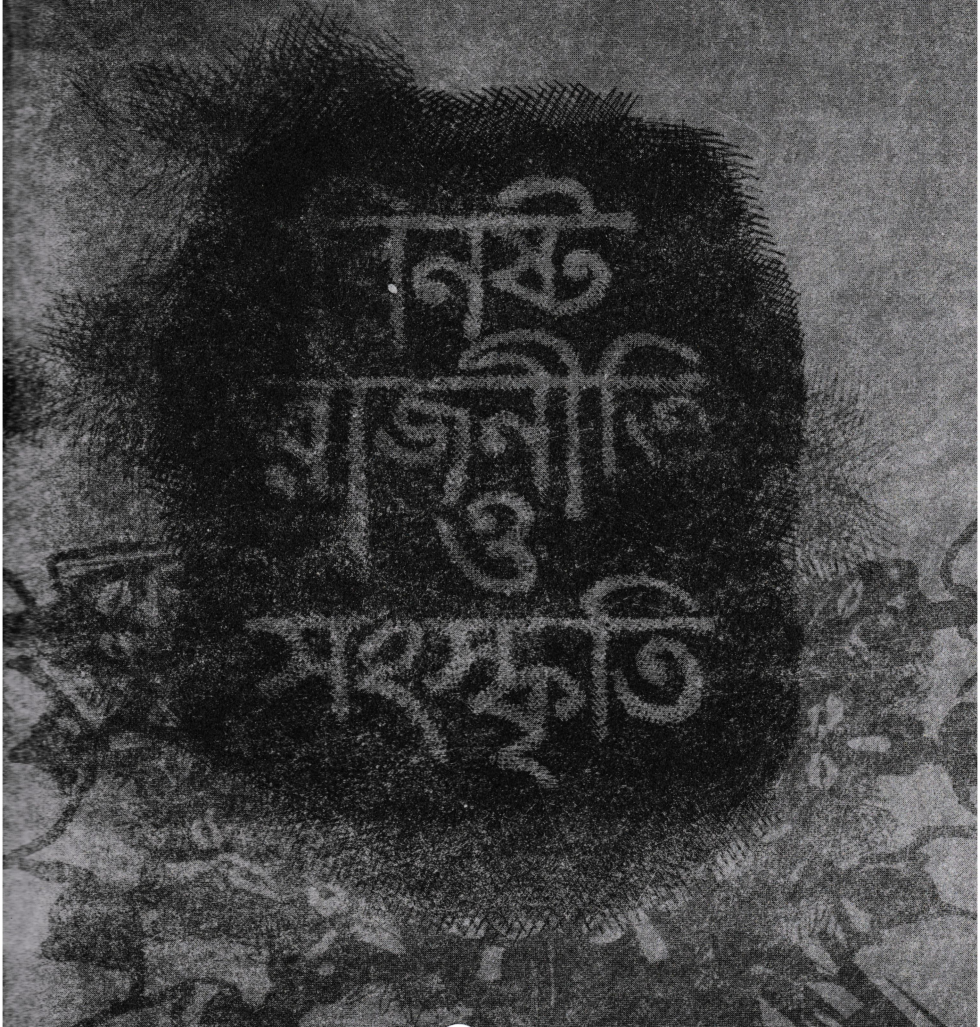

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনষ্ট রাজনীতি ও সংস্কৃতি
প্রবন্ধসংকলন
যতীন সরকার

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য
৩০০ টাকা

ISBN 984 70289 0188 6

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

তপন বাগচী
আমিনুর রহমান সুলতান
সাইমন জাকারিয়া
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

স্নেহভাজন বাণীসেবক চতুষ্টয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের নিবেদন

'সংস্কৃতিই মূল লক্ষ্য, রাজনীতি সেই লক্ষ্যসাধনের উপায় মাত্র'—হাঙ্গেরিয় দার্শনিক লুকাচের এই বক্তব্য আমার ভাবনাকে সর্বদাই আলোড়িত করে। বারবারই আমার লেখায় সেই আলোড়নের অভিব্যক্তি ঘটে। আমাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতি কীভাবে বিনষ্ট হচ্ছে, কোন্ কোন্ শক্তি সেই বিনষ্টির কারক, কী করে সেই বিনষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়—এ-সবের সুলুক সন্ধানেই আমি প্রয়াসী হয়েছি।

আমি কখনও নৈরাশ্যবাদকে প্রশ্রয় দিই না। তবে নিষ্ক্রিয় আশাবাদে আমার আস্থা নেই। সব লেখাতেই সক্রিয় আশাবাদকে সঞ্জীবিত রাখতে আমি সচেষ্ট থাকি, সে-চেষ্টায় কতটুকু সফল হই—সহৃদয় পাঠকগণই তার বিচার করবেন।

বইটি প্রকাশের জন্য *ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ*-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'বানপ্রস্থ'
সাতপাই, নেত্রকোনা

যতীন সরকার
ফেব্রুয়ারি ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

বিনষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা / ১১
পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতার ভূত ও বাঙালির সংস্কৃতি / ১৮
সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগ্রাম দিনবদলের লক্ষ্যে / ২৩
উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা / ৩০
প্রাচীন বস্তুবাদের উত্তরাধিকার ও লৌকিক ধর্ম / ৩৯
বিতর্ক ও বিতার্কিকের কাছে প্রত্যাশা / ৫৯
সাতই মার্চ : অসীম শক্তিধর অবিনাশী কথামালার জন্মদিন / ৬৫
নববর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব / ৭০
আমাদের নববর্ষ : অনন্য ও অতুলনীয় উৎসব / ৭৫
আদর্শ শিক্ষকের জন্য প্রত্যাশা / ৮০
মুক্তিযুদ্ধের সার্থকতার জন্য / ৮৯
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বনাম বিশ্বযুদ্ধ / ৯৪
বিজয়ের অন্তর্গত বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা / ৯৯
মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে / ১০৫
ব্যর্থ ভাষা-আন্দোলন ও অসম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ / ১১০
'ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে' / ১১৭
চব্বিশে এপ্রিল প্রায়-বিস্মৃত এক কৃষ্ণদিবস / ১২৪
নববর্ষের শপথ ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ / ১২৯
কবিতায় উৎসব / ১৩৬
জাতীয় দিবস : পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ / ১৪১
মাতৃভাষার অধিকার ও দায়িত্ব-চেতনা / ১৫০
প্রতীক নিয়ে লড়াই সংস্কৃতির লড়াই / ১৫৬
দুর্বুদ্ধিজীবীদের মোকাবেলায় সৎ বুদ্ধিজীবী / ১৬৩
সংবাদ-মাধ্যম অনাস্থার মরুভূমিতে আস্থার মরূদ্যান / ১৬৭
সংবাদপত্রের চরিত্র ও বর্তমান কাল / ১৭৪
সংবাদপত্রের সেকাল শ্রেণী সংগ্রামের দর্পণে / ১৮০
স্বাধীনতা, সুশাসন ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন / ১৮৭
আমাদের স্বাধীনতা ও রবীন্দ্র-নজরুল / ২০১
সামাজিক দুর্নীতি সম্পর্কে / ২০৬
অমূল্য বিদ্যাধনের মূল্যহীনতা / ২৩০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা

রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি? যদি থাকেও, তাহলে সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার থেকে 'রাজনৈতিক সংস্কতি' কি পৃথক কোনো প্রপঞ্চ? যদি পৃথক না হয়ে থাকে, তবে কোন্ সূত্রে সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতি এসে মিলতে পারে?

সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায়শই অনেক ধোঁয়াটে ধারণাকে আমরা আমাদের চেতনায় ধারণ করি। আমাদের অনেকের কাছেই সংস্কৃতি হচ্ছে গীত-বাদ্য-নৃত্য-অভিনয়-চারুশিল্পের মতো নন্দনকলারই অপর নাম। কখনও কখনও ব্যক্তিমানুষের পরিশীলিত চিন্তা ও আচরণকেও আমরা সংস্কৃতি বলে মনে করি। সংস্কৃতি বিষয়টাই আমাদের কাছে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা নির্বস্তুক, এর বস্তুগত কোনো রূপ আমাদের ধারণায় আসে না।

এই বিচারে রাজনীতি তো নিতান্তই সংস্কৃতি-বিরহিত একটি বিষয়। সংস্কৃতি-বিরোধী বললেও ভুল হয় না। রাজনীতিতে কোনো নীতির বালাই নেই, অন্যায্য বা অনৈতিক বলে রাজনীতিতে কিছু থাকতে পারে না—এমন কথাও বহু প্রচলিত। আবার এর বিপরীতে রাজনীতিকে যাঁরা 'নীতির রাজা' রূপে অবলোকন করতে চান, তাঁদেরও বোধে নীতির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কসূত্রটি তেমন স্পষ্ট নয়; তাই তাঁরাও 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' সম্পর্কে যথাযথ ধারণাটি ব্যক্ত করতে পারেন না।

অথচ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গেছে বলেই আমাদের সমাজ-জীবন প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হচ্ছে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার—এমন কথা তো আমরা সখেদে ও সক্রোধে প্রায়শই উচ্চারণ করে থাকি। কর্তৃত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়েই রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব সম্পর্কে অনেক আবেগাপ্লুত ও বিক্ষুব্ধ বাক্যাবলি আমাদের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে নির্গত হতে থাকে। আমরা বলি : রাজনৈতিক দলগুলো কেবল নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে, নেতা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেত্রীদের কোনো সৌজন্যবোধ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা-নেত্রীরা পরস্পরের মুখদর্শনও করতে চান না; জাতীয় ঐকমত্যের বদলে জাতিকে কেবল বিভক্তই করে চলছেন তাঁরা; যে-দল ক্ষমতায় যেতে পারে না সে-দলই ভোট কারচুপির অভিযোগে রাস্তা গরম করে তোলে; যখন-তখন হরতাল ও ধর্মঘট ডেকে জাতীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটায়; সাংসদরা দিনের পর দিন সংসদ বর্জনের বা সংসদকে অকার্যকর করে তোলার মতো দায়িত্বহীন আচরণ করে চলেন।

রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে এ রকম আরও অনেক অভিযোগ আমাদের আছে। তাঁদের এ ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণকেই আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব বা বিকৃতি বলে চিহ্নিত করি। খুব যে একটা ভুল করি, তা নয়। তবে ভুল না-করলেও এ-রকম ক্ষুব্ধ অভিযোগের মধ্য দিয়ে আমরা নিতান্ত খণ্ডিত সত্যকেই প্রকাশ করি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির অখণ্ড সত্যটিকে অবলোকন করতে চাইলে আরও অনেক গভীরে আমাদের দৃষ্টিক্ষেপ করতে হবে।

আসলে মূল 'সংস্কৃতি' থেকে বিচ্ছিন্ন 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' বলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের 'সম্যক কৃতি'। বস্তুগত ও ভাবগত সকল কৃতি নিয়েই মানুষের সংস্কৃতি। এই অর্থে সুকুমার শিল্পকলা যেমন সংস্কৃতি, তেমনই বিজ্ঞান-প্রযুক্তিও সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি বস্তুগত রূপবিহীন অ্যাবস্ট্রাক্ট একটি ধারণা মাত্র—এই ধারণাটিই ভ্রান্ত। পৃথিবীতে মানুষকে মানুষের মতো বেঁচে থাকার ও প্রতিনিয়ত বিকশিত হয়ে-ওঠার জন্য যে-সব কৃতির আশ্রয় নিতে হয়, সে-সবই সংস্কৃতি। তাই রাজনীতি ও রাজনীতিকদের কৃতিও সংস্কৃতিরই অন্তর্গত। তবে শুধু 'অন্তর্গত' বললেই পুরো সত্য কথাটি বলা হবে না। এক অর্থে রাজনীতি যদিও সংস্কৃতির ভেতরেই অবস্থান করে, তবু রাজনীতি একটি পৃথক প্রপঞ্চও বটে। আসলে যে-সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ করে তোলে সেই সংস্কৃতি-অর্জনের ও সংস্কৃতি-সাধনার পথ ও উপায়ই হলো রাজনীতি। হাঙ্গেরীয় দার্শনিক লুকাচের অনুসরণে বলতে হয়, 'সংস্কৃতিই লক্ষ্য, রাজনীতি সেই লক্ষ্যে পৌঁছার পথ মাত্র।' লক্ষ্য ও পথের পার্থক্য ভুলে গিয়েই আমরা অনেক সময় সংস্কৃতির অখণ্ড সত্যকে আড়াল করে ফেলি, এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ে নানা ধরনের ভ্রান্তিবিলাসে আক্রান্ত হই।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে আমাদের অঞ্চলের মানুষ মানবিক সংস্কৃতি-বিরোধী রাজনীতির খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল। এর ফলেই আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশটি 'পাকিস্তান' নামক একটি অপ-সাংস্কৃতিক তথা অমানবিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে, এই অপরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন অপ-রাজনৈতিক নেতারা যখন আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হেনে বসে, তখনই আমাদের সম্বিৎ ফিরে আসে। সংস্কৃতি-সচেতন হয়েই আমরা সংস্কৃতি-বিরোধী রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকি। আমরা স্পষ্ট বুঝে ফেলি যে, পাকিস্তানের রাজনীতি আমাদের ভাবগত সংস্কৃতি—অর্থাৎ আমাদের বর্ণমালা, আমাদের জাতীয় গৌরববোধ, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব, আমাদের কবি ও কবিতা, এবং এ-রকম সব কিছুকেই—ধ্বংস করে ফেলার পাঁয়তারা কষছে। সেই সঙ্গে আমাদের বস্তুগত সংস্কৃতির অর্জন থেকেও বঞ্চিত করছে, আমাদের অবস্থান-ভূমিটিকে উপনিবেশে পরিণত করে ফেলছে।

নিজস্ব ভাবগত ও বস্তুগত সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের বোধ জাগ্রত হয়েছিল বলেই পাকিস্তানি রাজনীতিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলাম। অপরাজনীতিকে প্রত্যাখ্যানই শুধু নয়, আমাদের নিজস্ব সুস্থ সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্যবিন্দুতে রেখে আমরা সংস্কৃতির সংগ্রামে নেমেছিলাম। সেই সংস্কৃতির সংগ্রামে বিজয় তথা আসল লক্ষ্যে পৌঁছার উপযোগী রাজনৈতিক পথও আমরাই তৈরি করে নিয়েছিলাম। যে রাজনৈতিক শক্তি আমাদের তৈরি সেই পথে চলতে স্বীকৃত হলো, সেই শক্তিকেই আমাদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করলাম। আমাদের পছন্দসই দলের নেতৃত্বেই সংঘটিত হলো স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে আমরা জয়ী হলাম, প্রতিষ্ঠা করলাম একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

এই নতুন রাষ্ট্রে রাজনীতিকদের কাছ থেকে জনগণ একটি মালিকানার দলিল আদায় করে নিয়েছিল। সেই দলিলে—অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে—রাষ্ট্রের উপর জনগণের সার্বভৌম মালিকানার কথাই শুধু লেখা হয়নি, সর্বতোভাবে পাকিস্তানি অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতির প্রভাবমুক্ত সুস্থ সংস্কৃতির আধারে সুষ্ঠু রাজনীতি ও প্রগতিমুখী রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকেও বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। জনগণের প্রতিনিধি রূপে রাজনৈতিক নেতারা এই দলিলের সব নির্দেশই পুরোপুরি মেনে চলতে বাধ্য। জনগণের অধিকারকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলার জন্য সময়ে সময়ে সেই দলিলে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানোরও প্রয়োজন পড়তে পারে বৈকি। তবে সেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাবে জনগণ নিজেরাই। এ-ব্যাপারে প্রয়োজনে তারা বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও নেবে। এবং সেই পরিবর্তনকে আনুষ্ঠানিকতা দেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য তাদের প্রতিনিধি-রূপে-নির্বাচিত রাজনীতিকদের যে-রকম নির্দেশ দেবে, রাজনীতিকদের বিনা বাক্যব্যয়ে সেই গণ-নির্দেশ পালন করতে হবে। জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার বাইরে কেউই ক্ষমতার গদিতে যেমন বসতে পারবে না, তেমনই জনগণের প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সকল গদিনশিনকেই বিনা বাক্যব্যয়ে গদি থেকে নেমেও যেতে হবে। এইসব বিধান মেনে চলাই হলো সকল রাজনীতিকের জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনীতিকদের কাছে এ-রকম প্রত্যাশা জনগণের ভাবগত সংস্কৃতিরই অংশ।

কিন্তু হায়, জনগণের এই সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা কখনও পূরণ হয় না। সাড়ে তিন দশকেরও অধিককাল ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতা দখলকারী ও দখলপ্রত্যাশী মূলধারার যে রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশে সক্রিয়, তারা এই প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে থোড়াই পরোয়া করে। গণপ্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হয়ে যাদের জনগণের সেবক হয়ে থাকার কথা, তারাই হয়ে যায় জনগণের প্রভু। আবার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের পক্ষেও এ দেশে খুব স্বল্প সময়ের জন্যই ক্ষমতার গদিতে আসীন থাকা সম্ভব হয়। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর পার হতে-না-হতেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, 'জনগণ রাষ্ট্রের মালিক'—এ-কথাটি কেবলই কথার কথা। পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও মালিকানা ফৌজি দখলে চলে যায়। সংবিধান-স্বীকৃত মালিকরা এই বেদখল-হয়ে-যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, ঠেকিয়ে রাখার তেমন কোনো চেষ্টাও চোখে পড়ে না।

এরপর দেড় দশক কালে দু'জন ফৌজি শাসক বাংলাদেশের সংবিধানের খোল-নলচে পালটে ফেলে একে স্বরূপত পুনঃপাকিস্তানিকরণের পথে ঠেলে দিলেন। পাকিস্তানিকরণ মানে তো শুধু রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিনষ্টি ঘটানোই নয়—সর্বপ্রকার সুস্থ মানবিক সংস্কৃতির উৎসাদন, উদার অসাম্প্রদায়িক মানবতন্ত্রের বদলে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মতন্ত্রের ক্ষমতায়ন, সমাজে ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বদলে ফৌজি স্বৈরতন্ত্রের আগ্রাসন।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকার বহন করে যে-জনগোষ্ঠীর মানুষেরা, যাদের আছে মরণজয়ী সংগ্রামের ঐতিহ্য, তারা যে স্বৈরতন্ত্রের পায়ে মাথা নত করে থাকতে পারে না, বিশ শতকের শেষ দশকের শুরুতে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানেও আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। এ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার যেমন পিছু হঠে, রাজনীতিকরাও তেমনই 'তিন জোটের রূপরেখা'র মাধ্যমে জনগণের সাংস্কৃতিক অভীপ্সাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে ওই বাধ্য-হয়ে-মেনে-নেয়া পর্যন্তই। নানা ধরনের ছল আর বলের আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতার গদিটি দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতিকদের অন্য রূপ। জনগণের সাংস্কৃতিক প্রত্যাশাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দেয়াই তখন তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে ওঠে। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' কিংবা 'ব্যক্তির চেয়ে দল এবং দলের চেয়ে দেশ বড়' বলে সারাক্ষণ গলাবাজি করে চলে যে-দল, বাস্তবে সে-দলের হাতেই জনগণের সকল ক্ষমতা অপহৃত হয়, সব কিছুই দলীয়করণের আওতায় চলে যায়। স্বাধীনতার চিহ্নিত দুশমনরাও এ-দলের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ভাগ বসায়। অর্থাৎ অনেক দামে কেনা স্বাধীনতাকেই ওরা জনগণের কাছ থেকে 'হাইজ্যাক' করে নিয়ে যায়। অনেক দিনের অনেক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণ যে একটি মাত্র রাজনৈতিক অস্ত্র হাতে পেয়েছিল, তার নাম 'ভোট'। গণবিরোধী রাজনীতি নানা কূটকৌশলের প্রয়োগে জনগণের হাতের 'ভোট' নামক এই অস্ত্রটিকেও ভোঁতা করে ফেলে, ভোটাভুটি তথা পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাটিই পরিণত হয় প্রহসনে, বাংলা ভাষায় যুক্ত হয় নতুন শব্দবন্ধ—'ভোট ডাকাতি'। ভোট ডাকাতের মতো গণ-দুশমনদের কাছে যারা রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রত্যাশা করবে, তাদের নির্বুদ্ধিতার কি কোনো সীমা-পরিসীমা আছে?

অন্যদিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলের উত্তরাধিকার বহনের দাবিদার গোষ্ঠীটিই কি পেরেছে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে? তাদেরই হাতে প্রণীত (এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অগণিত শহীদের রক্ত দিয়ে লিখিত) অসাধারণ সংবিধানটি প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা চূড়ান্তভাবে চরিত্রভ্রষ্ট হয় যখন, তখন এই চরিত্রভ্রষ্টতাকে প্রতিহত করার কোনো প্রকৃত উদ্যোগ কি গ্রহণ করেছিল তারা? কিংবা এখনই কি এ-ব্যাপারে তারা কোনো আন্তরিক প্রয়াসের পরিচয় দিচ্ছে? তার বদলে স্বাধীনতার চিহ্নিত দুশমনদের সঙ্গেই কি তাদেরকে 'কৌশলগত' সমঝোতা করতে দেখিনি আমরা?

হায়, কী দুঃখ, কৌশলের নামে নীতিকে জলাঞ্জলি দেয় যারা, সে-রকম সংস্কৃতিভ্রষ্ট ও অপরাজনীতির আশ্রয় গ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাতেই আজ আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এদেরই এক গোষ্ঠী বা অন্য গোষ্ঠীর বাইরে অন্য কোনো বাঞ্ছিত বিকল্প আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আর এই সুযোগেই অসাংবিধানিক অরাজনৈতিক অসাংস্কৃতিক নানা অপশক্তি নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। খুবই উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ এই পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। বর্তমানের অসুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বদলে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটানোর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গেই প্রতিহত করতে হবে বিরাজনীতিকায়নের সব ষড়যন্ত্রকেও। রাজনীতিকে তার যথাস্থানে ও যথাযোগ্য মানুষদের হাতে যথাবিহিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে দিতে হবে। অস্ত্রশক্তি, পেশীশক্তি বা অর্থশক্তির বলে গণশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে চায় যারা, তারা যাতে কমলবনে মত্তহস্তীর মতো রাজনীতির মঞ্চে দখল বসাতে না পারে—সেদিকে অতন্দ্র দৃষ্টি না রাখলেই নয়।

তবে সেই সঙ্গেই একটি কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতে চাই; সংস্কৃতিকে কোনোমতেই রাজনীতির অধীন হতে দেয়া চলবে না, রাজনীতির উপর সংস্কৃতির আধিপত্যকেই নিরঙ্কুশ করে রাখতে হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তেমনটিই আমরা রাখতে পেরেছিলাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামটি শেষ বিচারে অবশ্যই ছিল একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। এবং এই রাজনৈতিক সংগ্রামই সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ ধরে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিল, আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলাম। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, এর শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক সংগ্রাম রূপে। শুধু শুরু নয়। শুরু থেকে শেষ অবধি সেই সাংস্কতিক সংগ্রামের ধারাটি একান্ত রূপে জীবন্ত ছিল। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমগ্র চৈতন্যে ধ্রুবতারার মতো যা জ্বলজ্বল করছিল তা হলো তাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিই লক্ষ্যবিন্দু রূপে ছিল বলে অনায়াসে তারা ধনজনমান হারানোর দুঃখ সহ্য করে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে পেরেছিল। রাজাকার-আলবদর-আলশামস বা খোদ পাক মিলিটারির অত্যাচার-উৎপীড়ন-ধর্ষণ কোনো কিছুই সংস্কৃতি-সচেতন মুক্তিসংগ্রামী মানুষদের সংগ্রাম থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী অস্থায়ী সরকার বা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরকার কোন্দলও হার মেনেছে, জনগণের ওই সাংস্কৃতিক লক্ষ্যটির কাছেই।

কিন্তু মাত্র নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের শেষে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়ে যাওয়ার পর আনন্দে যেমন আমরা আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম, তেমনই তীব্র উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় নিস্তেজনার অবসাদও আমাদের পেয়ে বসেছিল। আনন্দে উদ্বেল ও অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েই আমরা নিষ্ক্রিয়তার গভীর খাদে ডুবে গিয়েছিলাম। আমাদের সংস্কৃতি-সচেতনতাও ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, এতদিনকার সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতাও আর বজায় রাখতে পারিনি আমরা। আমাদের এই অসচেতনতা ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগেই আমাদের শত্রুরা সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং আমাদের রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতৃত্বের একটা বড় অংশের উপরও এই শত্রুরা আছর করতে পেরেছিল। এরই অনিবার্য ফল রাজনৈতিক সংস্কৃতিসহ আমাদের পুরো সংস্কৃতিরই দেউলিয়া দশা প্রাপ্তি।

এই দেউলিয়া দশা থেকে মুক্তির একটাই পথ আমাদের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই বিনষ্ট রাজনীতির বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব। সে-রকম বিলুপ্তির ফলেই রাজনীতির সঠিক পথটি খুলে যাবে। সেই পথের উপর সংস্কৃতির দিক-নির্দেশক আলো ছড়িয়ে পড়বে। সেই পথ ধরেই লুকাচ-কথিত সংস্কৃতির লক্ষ্যে আমরা উপনীত হবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতার ভূত ও বাঙালির সংস্কৃতি

'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি যে সর্বদা খারাপ বা নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা অবশ্যই নয়। শব্দটির গঠনের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় যে, যা কিছু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা সম্প্রদায় সম্পর্কীয়, তা সবই সাম্প্রদায়িক (সম্প্রদায়+ঞিক)। কাজেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শব্দটি মোটেই নিন্দার্থক নয়। যদি বলি: দুর্গা পূজা, ঈদ, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা—এগুলো সবই সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান, তাহলে কি ওগুলোকে নিন্দা করা হলো? হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ—এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা এই অনুষ্ঠানগুলো তাদের নিজেদের ধর্মের অনুশাসন রূপেই পালন করে থাকে। তাই এগুলো সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান। এতে নিন্দার কিছু নেই। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলো যদি এ রকম হয়ে দাঁড়ায় যে হিন্দুরা দুর্গা পূজার পর বিসর্জন দেয়ার জন্য দুর্গা মূর্তি নিয়ে যাবে মুসলমানের মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে, কিংবা মুসলমান ঈদে গরু কোরবানি দেবে হিন্দু মন্দিরের সামনে, কিংবা খ্রীস্টান ও বৌদ্ধরাও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বড়দিন বা বুদ্ধপূর্ণিমা পালন করবে—তাহলে ঐসব অনুষ্ঠানগুলো নিন্দার্থেই হয়ে উঠবে সাম্প্রদায়িক।

অর্থাৎ বোঝা গেল যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ যদি তার নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কোনো পার্বন অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করে বা তার অনুভূতিতে আঘাত না দিয়ে পালন করে তাহলে সেটি সাম্প্রদায়িক হয়েও নিন্দনীয় হয় না। কিন্তু এর বিপরীতটি করলেই—অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়কে আহত করলেই—এটি নিন্দনীয় হয়ে ওঠে, এবং সেখানে সাম্প্রদায়িক শব্দটিও নিন্দাসূচক অর্থই বহন করে। এ রকমই অন্য সব ক্ষেত্রেও। উনিশ শতকের বাংলায় রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত মনীষীবৃন্দ 'হিন্দু' নামক একটি সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের আপন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার ও কদাচারের প্রাদুর্ভাব দেখে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই তাঁরা সেই সব কুসংস্কার ও কদাচার দূর করে আপন সম্প্রদায়ের সংস্কারসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের এই সংস্কার-প্রয়াসে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণই ছিল লক্ষ্য, তাই এই সংস্কারের প্রকৃতিও অবশ্যই ছিল সাম্প্রদায়িক। কিন্তু তাই বলে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে আমরা 'সাম্প্রদায়িক' বলে নিন্দা করতে পারি না নিশ্চয়ই। আপন সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা সাম্প্রদায়িক হয়ে যান নি। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি যদি তাঁদের ঘৃণা থাকতো, কিংবা অন্য সম্প্রদায়ের অকল্যাণের বিনিময়ে আপন সম্প্রদায়ের কল্যাণ করতে চাইতেন, তাহলেই তাঁরা 'সাম্প্রদায়িক' বলে নিন্দিত হতেন। তেমনি নিন্দিত হতেন বেগম রোকেয়াও, যিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীদের কল্যাণের জন্য তাঁর সকল কর্মপ্রয়াসকে নিয়োজিত করেছিলেন। বিশ শতকের বিশের দশকে যারা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠন করেছিলেন, সেই আবুল হোসেন-কাজী আবদুল ওদুদ-কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ মনীষীকে আমরা 'সাম্প্রদায়িক' বলে নিন্দা করতে পারতাম। কিন্তু তা আমরা করতে পারি না এ কারণে যে, তাঁরা আপন সম্প্রদায়ের প্রতি দরদী হয়েও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না।

কিন্তু দুঃখ এই : সবক্ষেত্রেই আমরা ঠিক একই রকম কথা বলতে পারছি না। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলায় সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট বা সম্প্রদায় সম্পর্কীয় অনেক কর্মকাণ্ডই যে স্বরূপত 'সাম্প্রদায়িক' হয়ে উঠেছে—সে কথাও আমাদের স্বীকার করতেই হচ্ছে। যাকে আমরা উনিশ শতকের 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস' বলি, সেটি যে অচিরেই রেনেসাঁসের সদর্থকতা পরিত্যাগ করে সংকীর্ণ হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের পরিণতি পেয়েছিল—সে তো এক মর্মান্তিক সত্য। তারই প্রতিক্রিয়ায় এলো মুসলিম রিভাইভ্যালিজম। অর্থাৎ নবযুগের নাগরিক মধবিত্তের হাতে সৃষ্ট আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতি হয়ে উঠল একান্তই সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি। এখানে এই সাম্প্রদায়িক শব্দটিকে আর কোনোমতেই সদর্থক বলার সুযোগ রইল না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বদলে বিভাজনই যেখানে বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই তো দেখা দেয় 'সাম্প্রদায়িকতা'। 'সাম্প্রদায়িক'—এই বিশেষণ শব্দটিকে প্রশংসার্থক না বললেও অন্তত নিরপেক্ষ বলা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু এই বিশেষণ শব্দটিতে 'তা' লাগিয়ে বিশেষ্য 'সাম্প্রদায়িকতা' করা হয় যখন, তখন তা পুরোপুরিই নিন্দার্থক হয়ে ওঠে। এই নিন্দার্থক সাম্প্রদায়িকতার দায় এড়াতে পারে না নব্য শিক্ষিত নাগরিক হিন্দু-মুসলমান কোনো বাঙালি মধ্যবিত্তই। এই মধ্যবিত্তরাই বাঙালির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটিয়েছে,একটি অখণ্ড বাঙালি জাতি সৃজনের প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত ব্যাহত করেছে, এবং পরিণামে বাঙালির রাষ্ট্রীয় দ্বিখণ্ডন ঘটিয়ে একটি অংশকে পাকিস্তান নামক একটি জঘন্য সাম্প্রদায়িক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার মতো পাপকর্ম করেছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তও তাকে করতে হয়েছে অগণিত বাঙালি নরনারীর প্রাণ ও মান উৎসর্গ করে। এ রকম কঠোর প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল যে একটি নতুন রাষ্ট্র, সেই বাংলাদেশই হচ্ছে এই উপমহাদেশে একমাত্র জাতিরাষ্ট্র। এমন একটি জাতিরাষ্ট্রের তো সাম্প্রদায়িকতার কোলে আত্মসমর্পণ করার কোনো কথা ছিল না। অথচ কথা না থাকলেও ঘটল তেমনটিই। প্রতিষ্ঠার অর্ধ দশক অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই এই সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্রটি লাগালো উল্টো দৌড়। তার ঘাড়ে এসে ভর করলো নিহত পাকিস্তানের ভূত। এই ভূতের আছর থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না একুশ শতকে পা দিয়েও। বরং এখন সেই ভূত যেন আরো জোরেশোরে জাঁকিয়ে বসছে, রাষ্ট্রের গদিটিতে পর্যন্ত দখল পেয়ে গেছে পাকিস্তানের অপজাতকেরা।

এ-রকম অবস্থাটাকেই চিরস্থায়ী বলে মেনে নিতে হবে আমাদের? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোনো পথই নেই?

দুই

না, চিরস্থায়ী নয় কোনোকিছুই; আর এমন কোনো সংকটও থাকতে পারে না, যা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই।

আমরা যে সংকটের কথা এখানে বলছি, তার প্রকৃতি অবশ্যই রাজনৈতিক; তাই রাজনীতি দিয়েই এ সংকটের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু রাজনীতিকে স্বয়ম্ভূ বা সর্বার্থসার মনে করলে চলবে না। যাকে আমরা রাজনীতি বলি, তারও মূলে আছে সংস্কৃতি। কিংবা বলা উচিত সংস্কৃতিই মানুষের সমস্ত কৃতির লক্ষ্য, এবং রাজনীতি হচ্ছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্য অনেক উপায়ের মতো একটি উপায় মাত্র। প্রখ্যাত হাঙ্গেরীয় দার্শনিক লুকাচ এভাবেই বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছিলেন।

বাংলা ও বাঙালির যে সংকটের কথা আমরা আলোচনা করছি তাতেও লুকাচীয় পর্যবেক্ষণই আমাদের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে। অতীতে আমাদের সব সংকটে পথ প্রদর্শক হয়ে এসেছে সংস্কৃতি-চেতনা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাঙালির ভাষার জন্য সংগ্রাম যে মূলত ছিল সাংস্কৃতিক সংগ্রাম, সে কথা তো সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্র বর্জন ও নজরুলের মুসলমানীকরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে সংগ্রামও তা-ই। ভাষার মতো নিজস্ব বর্ণমালা রক্ষার জন্যও বাঙালিকে সাংস্কৃতিক সংগ্রামে নামতে হয়েছে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লব্ধ সংস্কৃতি-চেতনাই বাঙালির জাতি-চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছে। জাতি-চেতনা থেকেই এসেছে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের তাগিদ। সেই তাগিদই প্রাণ ও মান উৎসর্গকারী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন বাংলাদেশের।

কিন্তু এরপর যে উল্টোরথের পালা এলো, তার কারণ সংস্কৃতি-চেতনা আমাদের নিস্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সেই নিস্তেজনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই সাংস্কৃতিক চেতনার পুনরুদ্বোধনের প্রয়োজন আজ বড় তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য হিন্দু ও মুসলিম রিভাইভ্যালিজমের খণ্ডিত ও বিকৃত সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে সামনে নিয়ে আসতে হবে আবহমান বাংলার অখণ্ড ও প্রকৃত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে। সেই উত্তরাধিকার ছড়ানো আছে বাঙালির লৌকিক জীবনের পরতে পরতে। আজও বাঙালি গায়েন পালা গান শুরুর আগে বন্দনা গায় এই বলে—

পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর ॥
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত।
যেখানে রাইখ্যাছে আলী মাল্লামের পাত্থর ॥
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান
উদ্দিশে জানায় গো সালাম মমিন মুসলমান ॥
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর।
যে দরিয়ায় বাণিজ্যি করছে চান্দ সওদাগর ॥

পুবের ভানুশ্বর, আলীর মাল্লামের পাথর, মক্কা হেন স্থান আর চান্দ সওদাগরের ক্ষীর নদী সাগর যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে, সেখানে 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?'

এই তো আসল বাঙলা ও বাঙালির সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মূল মৃত্তিকাজাত কবি অনায়াসে প্রশ্ন রাখতে পারেন—

সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীলোকের কী হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতায় প্রমাণ
বামনী চিনি কী ধরে?

'নানান বরণ গাভী রে তাই, একই বরণ দুধ/ জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত'–

এই হচ্ছে এ সংস্কৃতির মর্মবাণী। মতলবী রাজনীতি সংস্কৃতির এই মর্মবাণীর উপর ধুলোর যে পুরু আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছিল, তাকে সরাতেই হবে। তাহলেই বাঙালি সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িকতার রাহুমুক্ত হবে, রাজনীতিতেও পাকিস্তানের ভূতের আছর কেটে যাবে।

তিন

আজকে এ-সব বিষয় নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হচ্ছে। কারণ, একুশ শতকে পা দিয়ে বুঝতে পারছি, নিহত পাকিস্তানের ভূত কেবল বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির ঘাড়ে আছর করেই চুপচাপ বসে থাকে নি। সেই ভূত এখন বাংলা ও বাঙালির ঘাড় মটকে দেয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছে।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে দুর্গা পূজা ও ঈদকে উপলক্ষ করে সাম্প্দ্রায়িক সংঘাত হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগৃহীতও করেছে। সাম্প্রদায়িক ইতরামিতেও তখন ছিল 'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান' অবস্থা। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই অবস্থাটা পাল্টে গেল। এখানে হিন্দু শুধু সংখ্যায়ই লঘু হলো না, সম্পদে শক্তিতে আত্মবিশ্বাসেও একেবারেই হীন হয়ে পড়ল। আর সে হীনতা যে কতটা প্রকট হতে পারে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তিরিশ বছর পরে। নিতান্ত দৈবক্রমে যারা 'হিন্দু' নামক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মাতা-পিতার ঔরসে জন্ম নিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই হাড়ে হাড়ে বুঝল 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির সকল গর্ব একেবারে ধুলোয় মিশে গেল।

এখন আর তাই সময় ক্ষেপনের একটুও সময় নেই। আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির মরচে পড়া হাতিয়ারটিতে শান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সংস্কৃতি তথা সভ্যতা তথা মানবতার দুশমনদের উপর। পাকিস্তান আমলের চাইতেও গভীর ও প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক আন্দোলনই নতুন ও কার্যকর রাজনীতির উদ্বোধন ঘটাতে পারে। এবং কেবল সেই রাজনীতি দিয়েই সম্ভব অসভ্যতা ও অমানবিকতার অবাঞ্ছিত অন্ধকারকে দূর করা।

সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগ্রাম : দিনবদলের লক্ষ্যে

দিনবদল বা পালাবদল যা-ই বলি, সংস্কৃতির পরিবর্তন না-ঘটলে কোনো ক্ষেত্রেই সে-রকম কিছু ঘটতে পারে না। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ছাড়া সমাজ-পরিবর্তন কোনো মতেই সম্ভব নয়। আসলে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম আর সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম একান্তই সমার্থক।

তবে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট উপলব্ধির জন্য সবার আগে প্রয়োজন 'সংস্কৃতি' ও 'সাংস্কৃতিক সংগ্রাম' সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণাগুলো থেকে চিত্তকে মুক্ত করা। তা না হলে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের প্রকৃত ও গভীর তাৎপর্য অনুপলব্ধই থেকে যাবে।

যা মানুষকে 'সংস্কৃত' করে মানুষের সে-রকম সকল কৃতিই 'সংস্কৃতি'। কথাটাকে আরও স্পষ্ট করতে গেলে বলতে হবে : মানুষ তার যে-সব কৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত তার পরিপার্শ্বকে বদলাতে থাকে, এবং এ-রকম করে করে তার নিজেরও বদল ঘটিয়ে চলে—অর্থাৎ যে-সব মানবিক কৃতি প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই সংস্কৃত করে—সে-সবই সংস্কৃতি। সংস্কৃতিই গুহাবাসী মানুষকে প্রাসাদবাসী করেছে, জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে মানুষের আধিপত্যের বিস্তার ঘটিয়েছে। মানুষের প্রকৃতিবিজয় আর মানবসমাজের বিকাশ হাত ধরাধরি করে চলছে যে-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে, সেই পুরো প্রক্রিয়াটিই সংস্কৃতি। সেই প্রক্রিয়া বস্তুর সংস্কার ঘটিয়েই হয়েছে বস্তুগত সংস্কৃতি, আর মানবীয় আবেগ-অনুভূতিকে অবলম্বন করে তার সংস্কার সাধন করে জন্ম নিয়েছে আত্মিক তথা মানস ও ভাবগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি কেবল বিমূর্ত ভাবের বা অনুভবের বিষয় নয়, প্রমূর্ত বাস্তবও তার অন্তর্ভুক্ত।

অথচ আমরা প্রায়শ ভাবগত সংস্কৃতিকেই সংস্কৃতির একমাত্র রূপ বলে ধরে নিই, বস্তুগত সংস্কৃতি আমাদের বিবেচনার বাইরেই থাকে। আর সে-কারণেই সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সার্বিক তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-আবৃত্তি-ছবি আঁকার অনুষ্ঠানকে আমরা 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' বলে চালিয়ে দিই যদিও, 'সাংস্কৃতিক সংগ্রাম'-এর বেলায় কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনটি চালাতে গেলে বিশেষ বিপত্তিই ঘটে যায়। কারণ সাংস্কৃতিক সংগ্রামের আওতা অনেক বেশি প্রসারিত, বস্তুগত ও ভাবগত উভয় দিকেই তার বিস্তার। সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা পাকিস্তান-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম তথা সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম—এমন কথা বলতে হলে সংস্কৃতি সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করে এর গভীরতর ও ব্যাপকতর তাৎপর্যকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে।

মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যার সূচনা, আমাদের সেই ভাষা-আন্দোলনকে যখন সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করি, তখন তাতেই সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাত্রা বহুদূর প্রসারিত হয়ে যায়। আটচল্লিশ ও বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সূত্র ধরেই আমরা বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, রবীন্দ্রবর্জন ও রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে এবং নজরুলকে খণ্ডিতকরণের প্রতিবাদেও আমরা আন্দোলনে নেমেছি। এ-রকম সব আন্দোলন অবশ্যই ভাবগত সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এই সব ভাবগত আন্দোলনের ভিত্তিটি ছিল একান্তই বস্তুগত। কিংবা বলা যেতে পারে, ভাবগত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়েই আমরা বস্তুসচেতন হয়ে উঠেছিলাম। উপলব্ধি করেছিলাম 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রটি আমাদের ভাবসম্পদ অপহরণেই লিপ্ত হয় নি কেবল, বস্তুসম্পদ থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছে ও প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করেই চলছে। যদিও আমাদের অঞ্চলটিকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল, তবু এক হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী এই প্রদেশটিকে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি উপনিবেশে পরিণত করে ফেলেছিল। ওদের ঔপনিবেশিক শোষণেই বস্তুগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়েছিলাম। তাই ভাবগত সংস্কৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে যে-সংগ্রাম আমরা শুরু করেছিলাম, অচিরেই তা বস্তুগত অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। ভাবগত ও বস্তুগত সংস্কৃতি-সংগ্রামের একীভূত রূপই রাজনৈতিক আন্দোলনকে শক্তিমান ও বেগবান করে তোলে, এবং এক সময় সেটিই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে পরিণতি পায়। সেই মুক্তিসংগ্রামের ফসলই তো স্বাধীন বাংলাদেশ।

মুক্তিসংগ্রামের বিজয়কে যদিও আমরা সাধারণভাবে রাজনৈতিক বিজয় বলেই গণ্য করি, তবু গভীর অর্থে এটি সাংস্কৃতিক বিজয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে-সংবিধানটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রণয়ন করেছিলাম সেই সংবিধানটিকে শুধু একটি রাজনৈতিক দলিল বলে বিবেচনা করলে খুবই ভুল করা হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সংবিধানটিতে বিধৃত হয়ে আছে আমাদের পাকিস্তানবিরোধী সাংস্কৃতিক সংগ্রামেরই অন্তঃসার বা মূলমর্ম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদি সংবিধানটিতে পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির সকল পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পরিত্যাগ করে আমরা সম্মুখবর্তী ও প্রগতিমুখী ধ্যানধারণাকেই গ্রহণ করেছিলাম। অর্থাৎ বাংলাদেশের এই রাষ্ট্রীয় সংবিধানটি পাকিস্তানবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক সংগ্রামে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়েরই উজ্জ্বল স্মারক।

এখন প্রশ্ন সেই বিজয় ও তার স্মারককে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না কেন?

দুই

এ-প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গেলেই আমাদের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সকল সবলতা ও ইতিবাচকতার পাশাপাশি এর দুর্বলতা ও নেতিবাচকতাগুলোও প্রকট রূপে ধরা পড়ে যায়। স্বীকার না করে পারি না যে পাকিস্তান জামানায় যে-সাস্কৃতিক সংগ্রাম আমরা করেছিলাম তার প্রায় পুরোটাই ছিল প্রতিরোধমূলক ও রক্ষণাত্মক। পাকিস্তান যে আমাদের সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানছে—সে-বিষয়টি আমরা ঠিকই বুঝেছিলাম। আর তা বুঝেই সেই আঘাতের বিরুদ্ধে আমরা প্রত্যাঘাত হেনেছিলাম। সেই প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে শত্রুর হাত থেকে আমাদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে আমরা উদ্যোগী হয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেই সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ ও মর্ম অনুধাবনে কিংবা এর সৃজনাত্মক অনুশীলনে ও পুনর্গঠনে তেমন যত্নবান হই নি। পাকিস্তানবাদের ধর্মতন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতা যে অতিশয় মন্দ, এবং এর হাত থেকে যে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, সে-কথাটি আমরা কিছুটা উপলব্ধি করেছিলাম অবশ্যই।

কিন্তু সে-উপলব্ধি ছিল একান্তই আবছা ও ভাসা ভাসা। পাকিস্তান যে পবিত্র ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রকে যুক্ত করে দিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়েরই মর্যাদাহানি করেছে, ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুসারী হয়ে দেশের সকল জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিরুদ্ধ করেছে, শোষণভিত্তিক অর্থনীতির জাঁতাকলে গণমানুষের অধিকারকে পদদলিত করেছে—এ-বিষয়গুলো যে আমাদের অনুভবে ধরা পড়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে এ-সবের বিপরীত প্রত্যয়গুলোকেই আমাদের সংবিধানের চার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই চার মূলনীতির মূলমর্ম ও সঠিক প্রয়োগরীতির সবকিছুই যে সুস্পষ্টভাবে আমাদের চৈতন্যকে স্পর্শ করেছে, তেমন কথা কিছুতেই বলা যাবে না। আর সে-কারণেই রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীন দেশের অসাধারণ সংবিধানটির মর্যাদা রক্ষায় আমরা ব্যর্থ হলাম। এই ব্যর্থতার মধ্যেই আমাদের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের দুর্বল দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই দুর্বলতাগুলোর সবচেয়ে বেশি প্রকাশ ঘটেছে রাজনীতিকদের কথায় ও আচরণে। বিশেষ করে যে-রাজনীতিকবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন, যাঁদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাকে পরিচালনার দায়িত্ব, যাঁদের উদ্যোগে আদি সংবিধানটি প্রণীত হয়, তাঁরাই মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য ও সংবিধানের মূলনীতিগুলোর মূলমর্ম সঠিকভাবে তুলে ধরবেন—জনগণ তো এমনটিই প্রত্যাশা করে। কিন্তু তাঁরাই জনগণের এই প্রত্যাশাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতে গিয়ে এই রাজনীতিকরা কেবলই আমতা আমতা করেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়'—এমন নেতিবাচকতার ঊর্ধ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো ইতিবাচক মর্ম তাঁরা তুলে ধরতে পারেননি। জাতীয়তাবাদের নামে দেশের সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে তাঁরা 'বাঙালি' হয়ে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বোধে তাঁরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে তো পারেনই নি, বরং নানা উল্টাপাল্টা কথায় ও আচরণে বিভ্রান্তিরই বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর বাস্তবে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপটি কী হবে, গণমনে সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সঞ্চারেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতা তো আসলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষভুক্ত বড় রাজনৈতিক শক্তিটির সংস্কৃতি সম্পর্কীয় বোধের অস্পষ্টতা থেকেই উপজাত। তাঁদের বোধের সেই অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমানতাই মুক্তিসংগ্রামের তথা আমাদের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের শত্রুশক্তিকে বদমতলব হাসিলের সুযোগ করে দেয়।

আমরা দেখতে পেলাম স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই এ দেশে অবস্থানরত পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির ধারক-বাহক গোষ্ঠীগুলো অতিদ্রুত নিজেদের শক্তিকে সংহত করে নিচ্ছে। প্রথমে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে 'মুসলিম বাংলা'র জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উল্টোযাত্রা শুরু করে। তারা বলতে থাকে যে এই দেশ মুসলমানদের, এই দেশে কোনোমতেই ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বদলে ধর্মনিরপেক্ষতা চলতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতাসহ পুরো সংবিধানটিই ভারতের চাপিয়ে দেয়া—এমন প্রচারও তারা করে চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-রকম নানা অপপ্রচারের মধ্য দিয়েই তারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে বসে যাতে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের সেই অচিন্তিতপূর্ব ও মহামর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে যেতে পারে, এবং এর বিরুদ্ধে কোনো গণ-প্রতিরোধের সৃষ্টি হয় না। বলপূর্বক ক্ষমতাদখলকারী শক্তিগোষ্ঠী শহীদের রক্তেলেখা সংবিধানটির এমন বিকৃতি ঘটায় যে, দেশটি পাকিস্তান হয়ে না-গেলেও এখানে পাকিস্তানবাদের অপরাজনৈতিক দর্শনই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে-পরাজিত শক্তিটি স্বাধীন বাংলাদেশের খোলসের ভেতর পাকিস্তানের শাঁস ঢুকিয়ে দিয়ে বিগত দিনের গ্লানি মুছে ফেলে, এবং সাংস্কৃতিক বিজয় লাভ করে বসে। সেই সাংস্কৃতিক বিজয়ের সূত্র ধরেই মুক্তিযুদ্ধের চিহ্নিত শত্রুরা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতাতেও ভাগ বসাতে সক্ষম হয়। 'পাকিস্তান না-হলে বাংলাদেশ হতো না', 'বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উনিশ শো চল্লিশ সনের লাহোর প্রস্তাবেরই বাস্তবায়ন ঘটেছে' কিংবা 'সাতচল্লিশের চেতনাকে ধারণ করেই পরিচালিত হবে মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ'—এমন ধরনের মতলবি বক্তব্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার অপপ্রয়াসে তারা তো প্রায় পুরোপুরিই সফল হয়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়। পাকিস্তানবাদের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের জন্য বাংলাদেশের বুকেই 'পাকিস্তানের আজাদি দিবস' ও 'কায়েদে আজমের স্মরণ সভা'র অনুষ্ঠান করার মতো শক্তি ও সাহসও তারা অর্জন করে ফেলেছে। এই সব সভায় তারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, '১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ দেশের স্বাধীনতা আসে নি, জাতির স্বাধীনতা এসেছে পনেরোই আগস্ট।'

পনেরোই আগস্টে প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ করে তোলার জন্যই ওদের নিরলস প্রয়াস। ওদের ভেতর থেকেই তো উত্থিত হয়েছে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদ। সেই জঙ্গি মৌলবাদীরাই সশস্ত্র হামলা চালায় প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠনের সভায় ও অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন উপাসনালয়ে, এমন কি পীর-ফকিরের আস্তানায়।

এতসব কিছুর পর সাংস্কৃতিক সংগ্রামে আমাদের পরাজয়ের আরো কিছু বাকি থাকে কি?

তিন

আমার এতসব কথা বলার উদ্দেশ্য অবশ্যই হতাশার বিস্তার ঘটানো নয়। ঝড়ের দিনে ঝড়টাই-যে একান্ত সত্য নয়, তার প্রচণ্ড গর্জন সত্ত্বেও নয়—আমি বরং সেই মহাজন বাক্যেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ-রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস পোষণের পেছনে বিজ্ঞানের জোর আছে। সাংস্কৃতিক সংগ্রামে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে কখনো চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে না, বিজ্ঞান তো এমন কথাই বলে। সমাজ-পরিবর্তনের জন্য মানুষ এতকাল যে-যুদ্ধ করে এসেছে, সে-যুদ্ধে কখনো কখনো পরিবর্তন-বিরোধী শক্তির জয় হলেও সে-জয় একান্তই সাময়িক। তাই একটু আগে যদিও সংস্কৃতির সংগ্রামে আমাদের পরাজয়ের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, তবুও জানি ইতিহাস প্রকৃত বিজয়ের মালা সদর্থক ও প্রগতিমুখী পরিবর্তনকামী শক্তির গলাতেই পরিয়ে দেয়, নঞর্থক ও পশ্চাৎমুখী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কখনো ইতিহাসের দাক্ষিণ্য লাভ করে না। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও কোনো মতেই ইতিহাস যে উল্টো পথে হাঁটবে না—সে-ব্যাপারেও নিশ্চয়ই আমরা সন্দেহমুক্ত থাকতে পারি।

তবে মনে রাখা উচিত, সকল মানবিক কৃতি তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামে বিজয় খুব সহজে বা বিনা প্রতিরোধে ঘটে যায় না। শত্রুপক্ষের শক্তিকে খুব বাড়িয়ে দেখে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা যেমন ভুল, তার শক্তিকে একটুও পাত্তা না দিয়ে আত্মপ্রসাদে প্রসন্ন হয়ে থাকাও তেমনই আত্মঘাতী। এ-রকম আত্মঘাতী আত্মপ্রসাদে প্রসন্ন থেকেছিলাম বলেই বোধ হয় সাংস্কৃতিক সংগ্রামে শত্রুপক্ষের হাতে আমাদের বিপর্যয় ঘটেছে, এবং এখনও ঘটেই চলছে। সেই বিপর্যয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, এই মুহূর্তেই, নবতর সাংস্কৃতিক সংগ্রামে আমদের নেমে পড়তে হবে। এবার আর আগের ভুলগুলো করলে চলবে না। যে-কোনো উপায়ে ক্ষমতালাভে ও ক্ষমতা-আঁকড়ে-থাকতে-প্রত্যাশী রাজনীতিকদের সম্পর্কে সতর্ক না-থেকে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম করতে গেলে বারবারই বিপর্যস্ত হতে হবে। তাই, ও-পথে আর নয়। আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের মূলধারার রাজনীতি একান্তভাবেই সংস্কৃতিহীন বা অপসংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম আধার যে ছাত্র ও যুবশক্তি, সেই শক্তিকেও কলুষিত করেছে আমাদের কর্তৃত্বশীল রাজনীতিই। কাঙ্ক্ষিত সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামে মোটেই সহায়ক হতে পারে না এই রাজনীতি। এই রাজনীতি আত্মসমর্পণ করে বসেছে সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে, যে সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিনিয়তই আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে চলছে, একান্ত মুরুব্বিয়ানার ঢঙে আমাদের দেশটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মডারেট মুসলিম স্টেট' আখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলোকে আমাদের মাথার ওপর বসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছে। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কোনোমতেই সাধু হতে পারে না। আজকের নয়া সাম্রাজ্যবাদ তো তথাকথিত বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির দাপট দেখিয়ে আমাদের ভাবগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সংস্কৃতিকেই পঙ্গু করে ফেলতে চাইছে।

তাই আমাদের এখনকার সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রধান প্রতিপক্ষই সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক সংগ্রামে বিজয় লাভের মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশে দিনবদল ঘটানোর ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভব ঘটবে।

এ-রকমটি ঘটাতেই হবে, এবং তা ঘটানো অবশ্যই সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~